CONTAINS EXCLUSIVE BANGLA AND ENGLISH CONTENT

the ULABian

A Student Mouthpiece

কামাল লোহানী ● পৃষ্ঠা ৫

কৌতুক অভিনেতার গল্প ● পৃষ্ঠা ৭

msj.ulab.edu.bd/bss/ulabian, সামার ও ফল ২০২২ ৬৮৮ বেড়িবাঁধ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ফ্যা শ ন যে খা নে ব লে অ নে ক ক থা

ট্র্যাশন শো

ঋতুপর্ণা দেবমনি

ভাবুন তো, ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা হাতে নিয়ে আয়েশ করে পত্রিকার পাতায় চোখ বোলাচ্ছেন, কিন্তু পাতার পর পাতা কেবল মন খারাপ করা খবর। কোথাও খুন-রাহাজানি, সড়ক দুর্ঘটনা; কোথাও চলছে পরিবেশদূষণ, মাদক ব্যবসা, নারী নির্যাতন, লৈঙ্গিক বৈষম্য কিংবা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। হ্যাঁ, এটাই আজকাল আমাদের নিত্যদিনের ঘটনা, শান্তি আমাদের ত্যাগ করেছে বহু আগেই। চারদিকে এত অন্যায় আর অনাচার কালো থাবার মতো এসে আপনার শ্বাস রোধ করে ফেলতে চায়, আপনি চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে চান, কিন্তু পারেন না। আপনি না পারলেও প্রতিবাদের অভিনব এক ভাষা খুঁজে পেয়েছেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর শিক্ষার্থীরা।

পাবলো পিকাসো যেমনটা বলেছেন, শিল্প এমন একটি কৌশলগত মিথ্যা, যা আপনাকে সত্য বুঝতে বা অনুধাবন করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, শিল্প বা আর্ট যোগাযোগের এমনই এক মাধ্যম, যা আপাতদৃষ্টে দেখাবে এক রকম, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ আপনাকে ধাবিত করবে আরেকটি নিগূঢ় সত্যের দিকে, যা সাদা চোখে দেখলে অনুধাবন করা যায় না। যুগে যুগে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যখন সাধারণ জনগণের কণ্ঠ বারবার রোধ করে দেওয়া হয়েছে, তখন ভীম রণভূমে প্রতিবাদী যোদ্ধা হিসেবে বারবারই উঠে এসেছেন শিল্পীরা, তাঁদের সৃজনশীলতার প্রকাশের মাধ্যমে।

'ট্র্যাশন শো' ছিল এমনই একটি প্রয়াস, যেখানে প্রতিবাদ গিয়ে মিশেছে ফ্যাশন আর শিল্পের সঙ্গে। এখনকার 'ফাস্ট ফ্যাশন'-এর যুগে তাল মেলাতে গিয়ে আমরা কী পরিমাণ বর্জ্য উৎপাদন এবং পরিবেশ দূষণ করছি, নিজেরাও কি জানি? জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং পরিবেশ বাঁচাতে ইউল্যাব শিক্ষার্থীদের আয়োজিত ট্র্যাশন শোকে বলা যেতে পারে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। ট্র্যাশন শো হলো এমন এক ফ্যাশন শো, যেখানে শিক্ষার্থীরা ট্র্যাশ বা আবর্জনা পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে পোশাক তৈরি করেন এবং মডেলরা সেসব পোশাকে নিজেদের সাজিয়ে র‍্যাম্পে প্রদর্শন করেন।

র‍্যাম্পে পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে তৈরি স্কার্ট পরেছিলেন শিক্ষার্থী সৈয়দা শাওফতা নাজ বুশরা। তাঁর গালে ও চোখে ছিল অত্যাচারের কারণে পড়া কালশিটে, জামাকাপড় ছেঁড়া, তাতে রক্তের দাগ, পায়ে শিকল, হাতে-গলায় দড়ি। স্কার্টে খেয়াল করলে দেখা যাবে, খবরের কাগজের টুকরোগুলোর প্রতিটির শিরোনাম ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন আর গৃহস্থালি শারীরিক অত্যাচারের সংবাদ। কী? ভাবাচ্ছে?

'আমাদের দলের চেষ্টা ছিল সেই সব নারীর জীবনকে সামনে নিয়ে আসা, যাঁরা যৌন হয়রানি বা শারীরিক নির্যাতনের শিকার, কিন্তু তথাকথিত সমাজের চাপে নিজের অবস্থানে প্রতিবাদ করতে পারেন না। প্রতিদিন তাঁদের গল্প পত্রিকার পাতায় ছাপা হয়, কিন্তু দুই দিন পরেই আমরা তা ভুলে যাই।' দলের পক্ষে কথাগুলো বলছিলেন শাওফতা।

মোট ১২টি দলের প্রত্যেকেই বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাকে ভাবনায় রেখে পোশাক তৈরি করে। পলিথিন দিয়ে তৈরি বিয়ের পোশাক আপনাকে প্রচলিত গণ্ডির বাইরে গিয়ে ভাবতে বাধ্য করবে। আপনি ভাববেন, আরও নানা বিষয় নিয়ে যা আগে কখনও ভাবেননি; যেমন একজন কনের পোশাকের পেছনে তার শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিংবা মেয়েদের পোশাকে পকেট থাকে না কেন। শিক্ষার্থীর গলায় সিগারেটের মালা আপনাকে ভাবাবে মাদকের কুফল সম্পর্কে। পুরাতন সিডি/ক্যাসেটের তৈরি পোশাক আপনাকে ছোটবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে করে তুলবে স্মৃতিকাতর।

পলিথিন, খবরের কাগজ, পরিত্যক্ত সিডি, সিগারেটের খালি প্যাকেট ও ফিল্টার, প্লাস্টিকের বোতল– আপাতদৃষ্টে আবর্জনা; কিন্তু শিল্পীর মেধা ও মনন তাঁকে করেছে নান্দনিক এবং দর্শককে দিয়েছে সচেতনতার বার্তা। ট্র্যাশন শোতে যেমন উঠে এসেছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি সচেতনতা; তেমনি যৌন নির্যাতন বা শারীরিক নির্যাতন, মাদকবিরোধী সচেতনতা, সড়ক নিরাপত্তা, প্রযুক্তির আগ্রাসনে প্রকৃতির বিপর্যয়, লৈঙ্গিক বৈষম্যের মতো সামাজিক সমস্যাও তুলে ধরেছেন শিক্ষার্থীরা।

মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের কনভারজেন্স কমিউনিকেশন্স-১ কোর্সের শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কজাত এই ট্র্যাশন শো। 'আগে এই কোর্সে শিক্ষার্থীরা পারফরম্যান্স আর্ট এবং ইনস্টলেশন আর্ট নিয়ে কাজ করত। এবারে তাদের ফ্যাশন আর্ট নিয়ে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছি। কেননা আমি মনে করি, ফ্যাশন আর্ট আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং সামাজিক যোগাযোগের উন্নতির সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে জড়িত।' বলছিলেন কোর্সটির ইনস্ট্রাক্টর এ এফ এম মনিরুজ্জামান শিপু।

২ সেপ্টেম্বর ২০২২-এ ইউল্যাবের গবেষণা ভবন মিলনায়তনে ট্র্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল 'ব্যুরো ৫৫৫'। অনুষ্ঠানে ব্যুরো ৫৫৫-এর প্রতিষ্ঠাতা নুসরাত মাহমুদের পাশাপাশি বক্তব্য দেন ইউল্যাব মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের প্রধান অধ্যাপক জুড উইলিয়াম হেনিলো এবং ইউল্যাবের উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান।

ট্র্যাশন শোতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা (ওপরে)। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দের শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের কিছু মুহূর্ত। ছবিতে (বাঁ দিক থেকে) অধ্যাপক ইমরান রহমান, নুসরাত মাহমুদ, মনিরুজ্জামান শিপু এবং অধ্যাপক জুড উইলিয়াম হেনিলো।

ছবি: পিআরফরইউ

ভয়াবহ কিশোর গ্যাং

নির্মূলে পদক্ষেপ নিতে হবে এখনই

প্রতীকী ছবি, সূত্র: ডেইলি সান

বিশ্বজিৎ দাস

দৈনিক পত্রিকার পাতা কিংবা ফেসবুকের টাইমলাইন খুললেই দেখা যায়, তুচ্ছ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিশোর-তরুণদের হাতাহাতি, মারামারির সংবাদ; যা এখন নিত্যকার উদ্বেগের বিষয়। কিন্তু যত দিন পার হচ্ছে, কিশোরদের অপরাধগুলো ক্রমেই বাড়ছে; যা হিংস্র, নৃশংস ও বিভীষিকায় রূপ নিচ্ছে। খুন, মাদক, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যার মতো অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে উদ্বেগজনকভাবে। কিন্তু সমাজ তাদের নিয়ে কতটা ভাবছে?

কিশোর গ্যাং কালচার একদম নতুন নয় বাংলাদেশে। ছোটবেলা থেকে 'তিন গোয়েন্দা', 'মাসুদ রানা', 'বাকের ভাই'দের গল্প শুনে গ্যাং তৈরি করা কিশোরেরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখত, নতুন সমাজ গঠনের আশা জাগাত। কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেল ছোটবেলার সেই কিশোর গ্যাংগুলো? কয়েক বছর ধরেই হঠাৎ আলোচনায় আসে নতুন এক ধরনের 'গ্যাং কালচার'। উদ্বেগজনক তথ্য হলো, কেবল

প্রতীকী ছবি সূত্র: ভেক্টরস্টক

রাজধানীতেই ভয়ংকর কিশোর গ্যাংয়ের সংখ্যা ৭৮ এবং তাদের সদস্য সংখ্যা ২ হাজারের বেশি। এদের অনেকের কাছে রয়েছে নানা রকম অস্ত্র। বিভিন্ন ছত্রচ্ছায়ায় বেড়ে উঠছে অনেকে; আবার কেউ কেউ কাজ করছে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অনুচর হিসেবে।

চট্টগ্রাম মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, নগরে কিশোর গ্যাংয়ের তালিকায় ২৫২ কিশোরের নাম আছে। এই কিশোরদের 'বড় ভাই' হিসেবে ছায়া দিচ্ছেন অন্তত ৪৮ জন নেতা-সন্ত্রাসী।

কিশোর গ্যাং সংস্কৃতিটি আলোচনায় আসে ২০১৬ সালে, উত্তরায় স্কুলছাত্র আদনান হত্যাকাণ্ডের পর। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের পর উত্তরা, গাজীপুরসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় স্কুলছাত্র শুভসহ আরও কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। গত বছরের ৭ জানুয়ারি রাজধানীর কলাবাগানে আনুশকা নামের এক স্কুলছাত্রী তার বন্ধুর মাধ্যমে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় গত ২৩ ডিসেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকের প্রলোভন দেখিয়ে এক কিশোরীকে তিন দিন ধর্ষণ করে টিকটকার শিশির ও তার গ্যাংয়ের সদস্যরা। গত ১ আগস্ট নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে আহাদ আলম শুভ মিয়া নামের এক যুবককে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় বেপরোয়াভাবে সক্রিয় হয়ে উঠছে এসব গ্যাংয়ের সদস্যরা; বিশেষ করে মাধ্যমিক স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীরা এসব গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। কারণ, এই বয়সে ছেলেমেয়েদের আচরণ পরিবর্তিত হয়ে তাদের মধ্যে একধরনের 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব চলে আসে।

আমরা সবাই বলছি কিশোরদের অপরাধের কথা। কিন্তু দেশে এমন কতজন মানুষ আছেন, যাঁরা চিন্তা করছেন– কেন এই কিশোরেরা বিপথে যাচ্ছে? এই পথ থেকে তাদের ফেরানোর উপায় কী? কিশোর অপরাধ কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে– এসবের উত্তর খুঁজে পেতে হলে প্রথমেই যেতে হবে পরিবারের কাছে। কারণ, একজন কিশোর বেড়ে ওঠে তার পরিবারে, পরিবার থেকে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করার মাধ্যমে। সন্তান কার সঙ্গে মেলামেশা করে, কী করে, কোথায় যায়– এসব বিষয়ে মা-বাবাকেই সুনজর দিতে হবে। মা-বাবার সঙ্গে দূরত্ব, একাকিত্ব ও পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশের অভাবে কিশোরেরা জড়িয়ে পড়ছে এই ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। মূলত তারকাখ্যাতি, ক্ষমতা, হিরোইজম কিংবা অর্থের কারণে কিশোর গ্যাংগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে তারা; নয়তো নিজেরাই তৈরি করছে আলাদা কিশোর গ্যাং।

কিশোরদের এভাবে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে বিশ্লেষকেরা বলেন, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সমাজে নানা অসংগতি রয়েছে। নিজেদের স্বভাবসুলভ সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কিশোরেরা। তাদের আচরণেও ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। আবার কিশোরদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার বিষয়টি বিভিন্ন গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়। এতে তাদের মধ্যে একধরনের 'গ্যাং কালচার' গড়ে উঠছে।

এমন পরিস্থিতি থেকে কিশোরদের রক্ষা করার উপায় কী? কিশোর গ্যাং পরিস্থিতি এখন এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, এর নিয়ন্ত্রণে সামাজিক আন্দোলন খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। এই প্রজন্মকে অপরাধমুক্ত রাখতে হলে কিশোর অপরাধের লাগাম এখনই টেনে ধরতে হবে। তা না হলে দিন দিন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। কিশোর অপরাধ কমাতে এবং নির্মূল করতে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হবে। কিশোরদের অপরাধী হিসেবে না দেখে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য বেশি বেশি সংশোধনাগারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কিশোর গ্যাং কালচার প্রতিরোধ করা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একার পক্ষে সম্ভব নয়; কিংবা শুধু জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে, অভিভাবকদের সচেতন করে কিশোর গ্যাং নির্মূল করা যাবে, এমন আশা করা মোটেও সমীচীন নয়। অভিভাবক থেকে শুরু করে সমাজের সকল ক্ষেত্রের মানুষকে এই অপরাধ কমিয়ে আনতে এবং নির্মূল করতে এগিয়ে আসতে হবে। কিশোরদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। সেই সঙ্গে পরিবার ও সমাজের সঠিক পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণই পারে কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে।

পত্রিকাটি পাঠকের মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বদ্ধপরিকর। আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের জানাতে পারেন নির্দ্বিধায়। কিংবা আপনিও হয়ে উঠতে পারেন 'দ্য ইউল্যাবিয়ান' পরিবারের একজন। এমনটি ভেবে থাকলে আপনার লেখা পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়:

theulabian@ulab.edu.bd

দ্য ইউল্যাবিয়ান দল: প্রধান উপদেষ্টা: প্রফেসর জুড উইলিয়াম হেনিলো, পিএইচডি, **উপদেষ্টা সম্পাদক:** বিকাশ সিএইচ ভৌমিক, **সমন্বয়ক:** মো. রায়হান কবির শুভ্র, **সংবাদকর্মী ও সহযোগী:** বিশ্বজিৎ দাস বিজয়, মোঃ আবিদ হাসান সোহাগ, গিবসন মধু এরিক, নাহিয়ান জামাল জয়িতা, মাহযাবীন ইউসুফ, কাজী আঞ্জুম আকিব, আনাস ইমরান, মন্দ্রিলা মধুরিমা, নাজিফা আহমেদ, রুহামা নাবা, আদনান বিন হান্নান, নিশাত তাসনিম জেসিকা, **নকশা ও অলংকরণ:** 'দ্য ইউল্যাবিয়ান ডিজাইনিং টিম'

ছবি: টিম জেফ

বিশ্বের সবচেয়ে

নিঃসঙ্গ তিমি

শাফিন শুভ্র

ছোটবেলা থেকেই আমরা কমবেশি তিমির নাম শুনেছি। বিশাল আকৃতির এই প্রাণী সাধারণত সমুদ্রের গভীর জলে বসবাস করে। বহু প্রজাতির তিমির মধ্যে নীল তিমি পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী হিসেবে খ্যাত। আবার 'দ্য ডোয়ার্ফ স্পার্ম হোয়েল'কে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট তিমি হিসেবে ধরা হয়। এবার ভাবুন এমন একটি তিমির কথা, যা অন্য সব তিমির থেকে আলাদা। আকার-আকৃতিতে অন্যান্য তিমির মতোই দেখতে সে, কিন্তু তাকে মনে করা হয় বিশ্বের সবচেয়ে নিঃসঙ্গ তিমি। তিমি আবার নিঃসঙ্গ হয় কীভাবে? খুবই অবাক করা এক ব্যাপার, তাই না? এমনই এক প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা এই তিমিকে ট্র্যাক করে চলেছেন।

রহস্যটির সূত্রপাত ঘটেছিল উইলিয়াম ওয়াটকিন্সের মাধ্যমে; যিনি ছিলেন সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শব্দের মাধ্যমে শনাক্তকরণ এবং ট্র্যাকিং করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে হাইড্রোফোন নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়, যেটার মূল উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত সাবমেরিনের কথা শোনা। ওয়াটকিন্স সেখানে সমুদ্রের প্রাণীদের নিয়ে গবেষণা শুরু করতে গিয়ে প্রথম দিকেই একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলেন। তা ছিল একধরনের ভিন্ন ডাক, যা কিনা কিছু প্রজাতির তিমির মতো, কিন্তু আবার সব তিমির থেকে আলাদা। ওয়াটকিন্স সেটিকে একটি তিমির ডাক হিসেবেই চিহ্নিত করলেন, কিন্তু যেখানে তিমির ডাক প্রাথমিকভাবে ১৫ থেকে ৩০ হার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জের মধ্যে হয়ে থাকে, সেখানে এই তিমির ডাক ছিল ৫২ হার্টজ রেঞ্জে। এই ডাকার রেঞ্জ ছিল মানুষের শ্রবণের সর্বনিম্ন সীমায়।

তিমিটি এমন নয় যে সে অন্য তিমিদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে বা অন্য তিমির সংস্পর্শে আসে না। শুধু তার ডাকার ধরনটি আলাদা, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটি অনেক বড় প্রভাব ফেলেছে তার অস্তিত্বে। বিজ্ঞানীদের মতে, সে যেই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে অন্য তিমিদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে, তা কেউ শুনতে পারে না। শুনলেও তা বুঝতে পারে না। যেখানে বোঝারই ক্ষমতা নেই, সেখানে অর্থপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিমিটি যেন একটি ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, যার অর্থ জানা নেই এই পৃথিবীর কারও।

মার্কিন চলচ্চিত্র পরিচালক জশুয়া জিম্যান তিমিটিকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন, যার নাম 'দ্য লোনলিয়েস্ট হোয়েল: দ্য সার্চ ফর ৫২', কিন্তু তিমিটির খোঁজ পাওয়া এতটা সহজ নয়। একজন সমুদ্রবিজ্ঞানী একে অত্যন্ত কঠিন এক কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। যখন জিম্যান তথ্যচিত্র তৈরির জন্য তিমিটির খোঁজ করছিলেন, বিজ্ঞানীরা তাঁকে বলেছিলেন, তাঁরা কয়েক বছর ধরে তিমিটির ডাক শোনেননি। বিজ্ঞানীরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, তিমিটি মারা গেছে। এর কিছুদিনের মধ্যেই বিজ্ঞানীদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। আবারও তিমিটির ডাক ধরা পড়ল রেকর্ডিংয়ে, কিন্তু একটি ভিন্ন অবস্থানে। ওয়াটকিন্সের মতো প্রথম দিকের গবেষকেরা প্রাথমিকভাবে আলাস্কা উপসাগরে এবং পূর্ব-উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে তিমিটিকে ট্র্যাক করেছিলেন। এখন ধারণা করা হচ্ছে, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের কাছাকাছি।

তিমিটির এই নিঃসঙ্গতার গল্প ইতিমধ্যে কেড়ে নিয়েছে অনেক মানুষের হৃদয়, যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। এই তিমির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কিছুসংখ্যক মানুষ তাঁদের নিজেদের জীবনের মিল খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তার একাকিত্বে যেন ফুটে উঠেছে মানবতার সবচেয়ে গভীরতম বেদনার প্রতিচ্ছবি। মনে পড়ে যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গানের লাইন:

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।'

সূর্য প্রায় তার অর্ধ বয়স পূর্ণ করেছে

শৌভিক ফৌজদার

সূর্য আর কত দিন আলো দিতে পারবে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা মতামত দিলেন। পৃথিবীর যেমন বয়স বাড়ছে, তেমনি সূর্যেরও। এবার বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে কিছু মন্তব্য পৃথিবীবাসীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। পৃথিবীর শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস সূর্যের ধীরে ধীরে বয়স বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মধ্যবয়স পূর্ণ করে তা ধাবিত হচ্ছে।

ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি ২০১৩ সালে একটি মহাকাশযান পাঠিয়েছিল বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এই মহাকাশযানের নাম 'গাইয়া'। গাইয়ার তথ্যসূত্র থেকে সূর্যের বয়স অনুমান করা হয়ে গেছে। এই সূত্র ধরে আমরা জানতে পারি, বর্তমানে সূর্যের বয়স আনুমানিক ৪৫৭ কোটি বছর।

মূলত সূর্যের মধ্যে সংঘটিত হয় 'নিউক্লিয়ার ফিউশন' নামের এক জটিল প্রক্রিয়া। এটি সংঘটিত হয় অনবরত হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে। মূলত এই প্রক্রিয়ার ফলেই সূর্য থেকে অনবরত শক্তি নির্গত হচ্ছে এবং পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব ধরে রাখছে।

তবে সূর্যের মধ্যবয়সে আসার ফলে নানা রকম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সৌরঝড়, করোনাল ম্যাস ইজেকশন এবং মাঝেমধ্যে সৃষ্ট সৌরশিখা উল্লেখযোগ্য।

মূলত কোনো নক্ষত্রের ভরের ওপর নির্ভর করে তার বয়স অনুমান করা হয়। সূর্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এটি একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত গিয়ে তার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রাপ্ত হবে। তারপর ধীরে ধীরে সূর্য শীতল হতে শুরু করবে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, শীতল হওয়া শুরু হতে আরও প্রায় ৮০০ কোটি বছর লাগবে। অর্থাৎ এ সময়ের পর সূর্য ধীরে ধীরে শীতল হতে শুরু করবে। তবে এখানেই শেষ নয়, বিজ্ঞানীরা আরও বলেন, সূর্য যখন শীতল হতে শুরু করবে, তখন তার আয়তনও বৃদ্ধি পাবে। এরপর বৃদ্ধি পেতে পেতে তা যেন এক দৈত্যের আকৃতিতে পরিণত হবে। এসব হওয়ার মূল কারণ হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের জ্বালানি শেষ হওয়া। তা ছাড়া বিজ্ঞানীরা সূর্যের নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কেও জানিয়েছেন কিছু তথ্য। তাঁদের মতে, ১ হাজার ১০০ কোটি বছর পর পৃথিবীকে আলো দেওয়া হয়তোবা বন্ধ করে দেবে সূর্য।

বর্তমানে পৃথিবী প্রায় মধ্যবয়স পার করছে এবং অনেকটাই স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে।

ছবি: ভেক্টরস্টক

আইন না মানার সংস্কৃতি

মো. রায়হান কবির শুভ্র

ছবি: দ্য ডেপলিয়া

বাংলাদেশে আইন না মানার সংস্কৃতি অনেকের মধ্যে দেখা যায়। ইচ্ছা করে আইন অমান্য করার রেওয়াজ যেমন আছে প্রভাবশালী অনেকের, তেমনি নিরীহ মানুষের ওপর আইনের অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্তও নেহাত কম নয়।

সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে আমাদের সমাজব্যবস্থার একটি বিশেষ দিক স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে নিয়মকানুন না মানার প্রবণতা বেশি। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের উচিত রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনকানুন মেনে চলা। এ দেশে আইন-আদালত এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থাকা সত্ত্বেও আইনের শাসন মানার সংস্কৃতি এখনও পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। ফলে বাংলাদেশে ক্রমেই সামাজিক-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় পারিবারিক অশান্তি। সর্বোপরি জনসাধারণের মধ্যে বাড়ছে অপরাধ করার প্রবণতা; বিশেষ করে যাঁরা উচ্চ আসনে কিংবা বিশেষ পদে আসীন অথবা দলীয় ক্ষমতায় আসীন, সেই ব্যক্তিদের নাম ভাঙিয়ে তাঁদের কাছের ব্যক্তিদের মধ্যে আইন না মানার সংস্কৃতি তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। এই অবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে এবং নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বাহিনীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রত্যেক নাগরিকের উচিত ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং আইন মেনে চলার জন্য অন্যদের পরামর্শ দেওয়া।

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের আইনশৃঙ্খলা কিংবা ওই সব দেশের প্রচলিত নিয়মকানুন জনগণ কতটা মেনে চলে, তা ওই দেশের রাস্তাঘাট, যোগাযোগ এবং পরিবহনব্যবস্থার দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায়। বাংলাদেশের বড় শহরগুলোতে সড়কপথে চলাচলের জন্য যেসব নিয়ম কিংবা আইন আছে, সেগুলো পরিবহনমালিক, চালক ও শ্রমিকেরা সঠিকভাবে মানতে চান না। এমনকি আমজনতার মধ্যেও সিগন্যাল মেনে রাস্তায় চলাচল করার প্রবণতা কম। ফুটপাতে মোটরসাইকেল চালানো নিষেধ হলেও অবাধে তা চালানো হয়। এ ছাড়া দেখা যায়, ফুটওভারব্রিজ থাকা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়ে মানুষের রাস্তা পার হওয়া ইত্যাদি এখন মামুলি বিষয়ে রূপ পেয়েছে। এতে প্রায় সময়ই ঘটে চলছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এ ছাড়া সড়ক-মহাসড়কে নিত্যদিনে মৃত্যুর মিছিল বাড়তে বাড়তে যেন নিতান্তই সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কোনোভাবেই এর লাগাম টানা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির তথ্যমতে, প্রতিবারের মতো গত বছরও ঈদে সড়কে ঝরে গেল ৭৫টি তাজা প্রাণ। ঈদের পরদিনই নিহত হয়েছে ২০ জন। তবে এ বছর বেশি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে বাইকচালক ও আরোহীরা। ঈদের ছুটিতে ৩১ জন বাইকচালক ও আরোহী প্রাণ হারিয়েছেন। সড়কে দুর্ঘটনার কারণগুলো যখন সবারই জানা, তখন কেন এর সমাধান করা হয় না, এটাই বড় প্রশ্ন। কেবল সড়কেই যে আইন না মানার সংস্কৃতি দেখা যায়, তা কিন্তু নয়। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে সাইবার দুনিয়ায় রয়েছে নানা অসঙ্গতি। মহামারি করোনায় অনলাইনে নির্ভরতা বেড়েছে। এ সময়ে সাইবার স্পেসে ধর্মীয় বিদ্বেষ, নারীঘটিত মানহানি, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত আক্রমণ বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে। হালের জনপ্রিয় মেসেঞ্জার বা এনক্রিপ্টেড অ্যাপের মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের ব্যক্তিগত ছবি, ভিডিও শেয়ার করার প্রবণতা মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে। আর এসব কনটেন্ট যখন কোনো অসাধু ব্যক্তির দখলে চলে যায়, তখনই ঘটে ব্ল্যাকমেলের বিভিন্ন ঘটনা। করোনাকালে এ ধরনের ব্ল্যাকমেলের ধরনও বেড়েছে। শুধু নারী আর কিশোর-কিশোরীরা নয়, এ সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতাও ব্যাপক হারে সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলতে গেলে সেখানেও হতশাজনক চিত্র দেখা যায়। তৈরি পোশাকশিল্প থেকে রপ্তানি আয় আর বিদেশ থেকে আসা রেমিট্যান্স বাদ দিলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নাজুক অবস্থা বিরাজমান। প্রতিটি খাতে দুর্নীতি আর ঋণখেলাপি ক্রমে বেড়েই চলেছে। তাহলে প্রশ্ন, কেনই-বা এমনটা ঘটছে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দুরূহ বটে।

সমাজবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী, কোনো রাষ্ট্র তথা সমাজ যখন কোনো স্তর থেকে অন্য স্তরে অগ্রবর্তী হয়, তখন ওই সমাজে সব প্রচলিত নিয়মকানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা অনেক কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় যাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন, রাষ্ট্রের প্রতিটি খাতের দিকে তাঁদের অনেক বেশি সজাগ দৃষ্টি রেখে চলতে হয়। সমাজের যেখানেই বিধিবিধানের ব্যত্যয় ঘটে কিংবা নতুন বিধিবিধান জরুরি হয়ে পড়ে, সেগুলো প্রয়োজন ও যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সময়মতো প্রবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা পরিমার্জন করার উদ্যোগ নেওয়া হলে রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট পরিকাঠামোর মধ্যে চলতে পারে। আকাশসংস্কৃতির এই সময়ে ক্রমবর্ধমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য সবার আগে নতুন রূপে সাজাতে হয় শিক্ষাব্যবস্থাকে। কেননা উন্নয়ন ও পরিবর্তনের জন্য দক্ষ, যোগ্য, মেধাবী ও মননশীল শিক্ষিত জনগোষ্ঠী খুব প্রয়োজন।

মননশীল জাতি গঠনের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি দক্ষ, যোগ্য ও মেধাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কেবল বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতির পেছনে সময় ব্যয় করার মানসিকতা থেকে তরুণ প্রজন্মকে বের করে আনতে হবে, এর মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও গবেষণায় রাষ্ট্র এগিয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আঁতুড়ঘর হওয়ার কথা ছিল, সেখানে দেশের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় সেই ভূমিকা রাখতে পারছে না। একটি দেশের সৎ, মেধাবী, মানবিক ও সৃজনশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প নেই। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন সুযোগ না থাকায় মেধাবী ও দেশপ্রেমী জনগোষ্ঠী গড়ে উঠতে বেগ পেতে হচ্ছে।

মানবিক মূল্যবোধ ও সৃজনশীল শিক্ষাই পারে আমাদের আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটাতে; জ্ঞান ও মানবিকতার বিকাশ ঘটাতে। আইন না মানার অপসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এলে সমাজে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। এ ছাড়া আইনের শাসন বাস্তবায়নে আইনের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে পাঠ্যক্রমে সংযোজন এখন সময়ের দাবি। এর মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আইনকানুন বিষয়ে অধিক সচেতনতা গড়ে উঠবে। এ দেশ হবে সভ্য, সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

কামাল লোহানী

দ্বীন মোহাম্মাদ সাব্বির

আবু নঈম মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল খান লোহানী। ডাকনাম 'কামাল লোহানী'। জন্মের ৭ বছরের মাথায় মাকে হারিয়ে তাঁর রঙিন শৈশবে নেমে আসে কালো অন্ধকার। অবুঝ শৈশবে মাতৃবিয়োগের বেদনা ব্যাপক অর্থে অনুভব না করলেও মাতৃস্নেহ তাঁর কাছে অধরাই রয়ে যায়। তবু মা হারা শৈশবের আঁধার তাঁর বেড়ে ওঠাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। অসীম প্রতিভা, নেতৃত্বের বিশেষ গুণ ও দৃঢ় কর্মপ্রেম তাঁকে নিয়ে গেছে শিকড় থেকে শিখরে।

সাংবাদিকতা, রাজনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী। সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ভাষা সংগ্রাম, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে অসামান্য ভূমিকায় ছিলেন তিনি। এ দেশের সাংবাদিকতা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে 'কামাল লোহানী' শুধু একটি নাম নয়, যেন এক সোনালি ইতিহাস। ইতিহাসের অসংখ্য আলোচিত আন্দোলন-সংগ্রামের নেপথ্যে নেতৃত্ব দিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং বেতারের সঙ্গেও কাজ করেছেন। জীবদ্দশায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতারের পরিচালক, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে দূরদর্শিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আজও প্রশংসিত হয়ে আছেন।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার সনতলা গ্রামে ১৯৩৪ সালের ২৬ জুন বাবা আবু ইউসুফ মোহাম্মদ মুসা খান লোহানী ও মা রোকেয়া খান লোহানীর ঘর আলোকিত করে জন্ম নেন কামাল লোহানী। এরপর কলকাতার শিশু বিদ্যাপীঠে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হলেও তিনি পাবনা জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন তিনি।

তাঁর চাচাতো বোন সৈয়দা দীপ্তি লোহানীকে ১৯৬০ সালে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি। কামাল লোহানীর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অনুপ্রেরণাদাত্রী হিসেবে সব সময় পাশে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। দীপ্তি লোহানীর প্রয়াণে ৪৭ বছরের দাম্পত্য জীবনের অনুপ্রেরণাদাত্রীকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে যান কামাল লোহানী। তাঁদের ঘরে তিন সন্তান– এক ছেলে সাগর লোহানী এবং দুই কন্যা বন্যা লোহানী ও উর্মি লোহানী।

সাংবাদিকতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর যেমন অনেক অবদান ছিল, ঠিক তেমনিভাবে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও অগ্রণী ভূমিকা ছিল কামাল লোহানীর। স্কুলে লেখাপড়া করা অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যোগ দেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। ১৯৫৫ সালে তিনি ন্যাপে যোগ দিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হন। সাম্রাজ্যবাদী চক্রের ছোবল থেকে সংস্কৃতিকে রক্ষার যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে তিনি কখনও পিছু হটেননি। তিনি রাজনৈতিক নেতা না হলেও সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির যে যোগ, তা উপলব্ধি করেছিলেন যথার্থভাবেই। সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য তাঁর যে সংগ্রাম, তা তাঁর কর্মজীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে একাধিকবার। এ কারণে তাঁকে বারবার কারাবরণও করতে হয়েছে। বাম রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় পরিবার-পরিজন ছেড়ে মাত্র ১৩ টাকা সঙ্গে নিয়ে তাঁকে বাড়ি ছাড়তে হয়। সুখী-সমৃদ্ধ জীবনকে পরিহার করে, জীবনের বন্ধুর-কন্টকাকীর্ণ পথে পা রাখা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশ বেতারের সাবেক পরিচালক শেখ রেফাত আলী তাঁর একটি লেখায় কামাল লোহানী সম্পর্কে বলেছেন, যৌবনে রাজপথে স্লোগানে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন কামাল লোহানী। মিছিলে, মিটিংয়ে কণ্ঠকে কাজে লাগালেও কখনও পাকিস্তান রেডিওতে পা বাড়াননি; বরং মানুষটি দেশের জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ সম্প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালে দৈনিক মিল্লাত পত্রিকা দিয়ে তাঁর সংবাদপত্রে কর্মজীবন শুরু হয়। এরপর দৈনিক আজাদ, দৈনিক সংবাদ, পূর্বদেশ, দৈনিক জনপদ, বঙ্গবার্তা, দৈনিক বাংলার বাণীসহ অসংখ্য সংবাদপত্রের সঙ্গে কাজ করেছেন কামাল লোহানী। কখনও পত্রিকার মালিকপক্ষের সঙ্গে আপোস করেননি কামাল লোহানী। তিনি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। সংবাদকর্মীদের স্বার্থ আদায়েও অসংখ্যবার রাস্তায় নেমেছেন কামাল লোহানী।

কামাল লোহানী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বার্তা বিভাগের প্রধানই শুধু নন, এ বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক ও শব্দসৈনিক ছিলেন। সংবাদপাঠ থেকে শুরু করে বেতারের সবখানেই তিনি ছিলেন সরব। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের বার্তাটি রচনা ও পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কামাল লোহানী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চার বছর বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি ছিলেন। কর্মময় জীবনে অসংখ্য বই রচনা করে গেছেন তিনি। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে– আমরা হারবো না, সত্যি কথা বলতে কী, যেন ভুলে না যাই, মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার, রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলা বেতার, মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার, এ দেশ আমার গর্ব, আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, লড়াইয়ের গান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নৃত্যশিল্পের বিস্তার, দ্রোহে প্রেমে কবিতার মত এবং কবিতার বই শব্দের বিদ্রোহ।

কামাল লোহানী ২০১৫ সালে সাংবাদিকতায় একুশে পদক লাভ করেন। এ ছাড়া জাহানারা ইমাম পদকসহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন।

করোনা মহামারিতে মৃত্যুর দীর্ঘ মিছিলে রাজনীতি, চলচ্চিত্র, শিক্ষা, গণমাধ্যম, সাহিত্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি অঙ্গনের অনেককে হারিয়েছে বাংলাদেশ। করোনায় আক্রান্ত হয়ে সেই মৃত্যুর মিছিলে যোগ হয়েছিল এই কিংবদন্তির নামও। ২০২০ সালের ২০ জুন ঢাকার শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন কামাল লোহানী। তিনি সশরীরে আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর কাজের জন্য আজীবন বেঁচে থাকবেন মানুষের হৃদয়ে।

ছবি: নাহিদ হোসেন

সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শন

বগুড়ার বৈরাগী ভিটা

নিশাত তাসনিম জেসিকা

সুজলা-সুফলা আমাদের এই বাংলাদেশ। এ দেশে নদী, সমুদ্র, ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনসহ রয়েছে প্রায় ২ হাজার ৫০০টি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বগুড়ার মহাস্থানগড়, লালবাগ কেল্লা, নারায়ণগঞ্জের হাজীগঞ্জ দুর্গ, নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির এবং বাগেরহাটের সাতগম্বুজ মসজিদ। এসব স্থানে রয়েছে হাজার হাজার পুরাতন নিদর্শন, এগুলো বাংলাদেশের সভ্যতার পরিচয় বহন করছে। আর এসবের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শন হচ্ছে মহাস্থানগড়, যা ইতিহাসের পাতায় বৈরাগীর ভিটা নামে পরিচিত। অবশ্য এই ভিটার নামকরণ নিয়ে রয়েছে এক ইতিহাস। কথিত আছে, এই স্থানে একটি মন্দির এবং রাজবাড়ী ছিল; আর সেই রাজবাড়ীতে স্বয়ং রাজা নিজ হাতে মনীষী বৈরাগীদের খাবার পরিবেশন ও আপ্যায়ন করতেন বলে স্থানটির নাম বৈরাগীর ভিটা রাখা হয়। এই স্থান মহাস্থানগড়ের দুর্গনগরীর দক্ষিণ দিকে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এটি ১৮২৯ সালে প্রথমবার এবং ১৯৭৭ সালে দ্বিতীয়বার খনন করা হয়েছিল। ১৮২৮-২৯ সালে যখন খনন করা হয়, তখন পাল আমলের প্রথম এবং শেষ পর্যায়ের দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। পাল যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে মন্দিরটির ভিত্তিপ্রাচীর ছিল উত্তর দিকে ২৯ দশমিক ৮৭ মিটার এবং পূর্ব দিকে ১২ দশমিক ৮ মিটার। এই যুগের শেষ পর্যায়ে মন্দিরটির ভিত্তিপ্রাচীর ছিল ৩৩ দশমিক ৮৩ মিটার বাই ১৩ দশমিক ৭ মিটার, যা আগেরটির তুলনায় অনেক বড়। এই মন্দির দুটি মূলত নালা দ্বারা বিভক্ত ছিল। নালার একটি অংশ ইট এবং অপর অংশ কষ্টিপাথরে তৈরি করা হয়েছিল। এই নালা দুটি ব্যবহৃত হতো বিভিন্ন আবর্জনা বাইরে ফেলে দেওয়ার জন্য। ধারণা করা হয়, এই নালা আনুমানিক ১২ দশমিক ৭ সেন্টিমিটার। নালা ছাড়াও মন্দিরটি ছিল কারুকাজে সুসজ্জিত। এর মাঝে কারুকাজবিশিষ্ট দুটি স্তম্ভ আছে, যা ওই যুগের ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে। মূলত কারুকাজের মধ্য দিয়ে ওই যুগের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সম্পূর্ণ মন্দিরটি মোল্ডেড দ্বারা অলংকৃত। মন্দিরের কোনাগুলো গোলাকৃতির এবং পাথরগুলো অর্ধ পদ্মফুল আকৃতির পদক। এ ছাড়া সেই যুগের ফুলের নকশায় মন্দিরের কোনাগুলো শোভিত ছিল।

পাল আমলের শেষের দিকে উদ্ধার করা মন্দিরটির উত্তর দিকে একটি ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। ওই স্থানে প্রায় ২৩টি কামরার অস্তিত্বের সন্ধান মেলে এবং এই কামরাগুলো সেই আমলের ইট দিয়ে বাঁধানো ছিল। পরে খনন করার মধ্য দিয়ে আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করা হয়। যেমন, এই মন্দিরের তলদেশে পাল যুগ ও গুপ্ত যুগের প্রচুর তথ্য, ইতিহাস এবং ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের যৌথ উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো খননকাজ শুরু করা হয়। অতঃপর ২০১৪ সালে আড়াই হাজার বছর আগের তিনটি পাতকুয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনটি পাতকুয়া ছাড়াও খ্রিস্টপূর্ব প্রথম অব্দ থেকে সপ্তম শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়। আরও পাওয়া যায় সে সময়কার যাতায়াতের জন্য তৈরি সড়কের আংশিক খণ্ড এবং কারুকাজ করা বিভিন্ন পোড়ামাটির ফলক। সন্ধান মিলেছে সেই আমলের মন্দিরের পূর্ব পাশে অবস্থিত শিলাদেবীর ঘট এবং দক্ষিণ পাশে পরশুরাম প্যালেস ও জিয়েতকুণ্ডুর। আর একই পাশে তিনটি কূপ থাকায় ধারণা করা হয়, সেই স্থানে পানি সুপেয় করা ছিল এবং স্থানটি থেকে আশপাশের এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ করা হতো। তা ছাড়া এই স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ময়কর বস্তুর সন্ধান মেলে। যেমন, ভাঙা পাত্রের অংশবিশেষ, পিরামিড আকৃতির বিভিন্ন নকশা, এমনকি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী; যা পাল, গুপ্ত ও সেন যুগের ঐতিহ্য। এসব সামগ্রী দেখলে সহজেই বোঝা যায়, সেই আমলের রাজারা কতটা শৌখিন ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। পাশাপাশি খুঁজে পাওয়া তিনটি কূপ এবং সড়কের আংশিক খণ্ড দেখে অনুধাবন করা যায়, তাঁরা রাজ্যের উন্নয়ন এবং সৌন্দর্যবর্ধনে সর্বদা চেষ্টা করতেন। এই বৈরাগী ভিটার মতো আরও অনেক ঐতিহাসিক স্থান ও দুর্গ রয়েছে আমাদের এই বাংলায়। যেমন বেহুলার বাসর ঘর, গোবিন্দ বিহার এবং ভাসু বিহারের মতো বেশ কিছু স্থান খুঁজে পাওয়া যায়।

এ দেশে এখনও অনেক প্রত্নসম্পদ মাটি চাপা পড়ে আছে। ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে যখন সভ্যতা আসেনি, তখন থেকে পাল, সেন এবং গুপ্তরা এ দেশে ব্যবসা করতে আসে। পরবর্তী সময়ে তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং তারাই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। যার জন্য বড় বড় মন্দির, প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছিল সহস্র বছর আগে। তা ছাড়া রাজ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও আকর্ষণীয় করতে নির্মাণ করা হয়েছিল কারুকাজসম্পন্ন দুর্গ। সেই সব মহল, রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, মন্দির ও দুর্গ অবশ্য কালের বিবর্তনে মাটি চাপা পড়ে গেছে। তা ছাড়া অনেক বস্তু খুঁজে পাওয়া গেছে; যেগুলো আমাদের কাছে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু হিসেবে বিবেচিত। এসব স্থান পরিদর্শন করতে বাইরের দেশ থেকে অসংখ্য পর্যটক আমাদের দেশে আসেন। এই সব স্থান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। তারা এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নতুন সব প্রত্নস্থান আবিষ্কার করার জন্য।

ছবি: আশিক মাহবুব

সর্বকালের সেরা কৌতুক অভিনেতার গল্প

নিশাত তাসনিম জেসিকা

দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া মানুষের কাছে দারিদ্র্য অভিশাপের থেকে কম কিছু নয়। নির্যাতিত দরিদ্র পরিবারগুলো যেন ধনী পরিবারের পায়ের ধুলোর মতো। দরিদ্র পরিবারের কষ্ট ও যন্ত্রণা ধনী পরিবারের কাছে যেন বিনোদনের বিষয়। এটি ১৬ এপ্রিল, ১৮৮৯ সালে দক্ষিণ লন্ডনে একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণকারী ছেলের মাধ্যমে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছিল। ছেলেটির মা, বাবা– দুজনেই ছিলেন ছোট মঞ্চের শিল্পী। তাঁর মা যখন স্টেজ শোতে বড়লোকদের সামনে গান গাইছিলেন, হঠাৎ তাঁর কণ্ঠ থেমে গিয়েছিল। তখন বিত্তবানেরা তাঁর ওপর রাগান্বিত হয়ে আজেবাজে কথা বলছিল। বিষয়টি লক্ষ করে আতঙ্কে শিশুসুলভ কণ্ঠে মায়ের গান গাওয়ার চেষ্টা করছিল ৫ বছরের ছেলেটি। যা দেখে জনতা হাসিতে ফেটে পড়ে। ছেলেটির আতঙ্ক আর যন্ত্রণা সেখানে উপস্থিত লোকজনের জন্য কৌতুকের বিষয় ছিল। তারা বিষয়টি অনেক উপভোগ করেছিল এবং মঞ্চে বিপুল পরিমাণ মুদ্রা ছুড়ে ফেলেছিল। তখন ছেলেটি বুঝতে পারল, গরিব মানুষের দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্ট ধনী মানুষের বিনোদন মাত্র। আর তখনই সে তার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করল। ছেলেটি আর কেউ নয়– 'চার্লি চ্যাপলিন', সর্বকালের অন্যতম সেরা অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং সুরকার।

১০ বছর বয়সে, চ্যাপলিন দ্য এইট ল্যাঙ্কাশায়ার ল্যাডস নামে ক্লগ নর্তকদের একটি দলে প্রবেশ করেন। তাঁরা ইংল্যান্ড জুড়ে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর মা একজন প্রতিভাবান গায়িকা ছিলেন এবং তাঁর বাবা একজন সফল ভাউডেভিলিয়ান ছিলেন যতক্ষণ না তিনি মদ্যপান শুরু করেন। চার্লি চ্যাপলিনের বাবা-মায়ের বিবাহবিচ্ছেদ হলে চ্যাপলিন এবং তাঁর সৎভাই সিডনি তাঁদের শৈশব ওয়ার্কহাউস এবং দাতব্য বাড়িতে অতিবাহিত করেন; ওই সময়টায় তাঁদের মাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ১৯২১ সালে চ্যাপলিন তাঁর মাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁর কাছে নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত তিনি মানসিক হাসপাতালে অবস্থান করেছিলেন। ১৯১০ সালে চ্যাপলিন একটি ইংরেজি মিউজিক হলে 'এ নাইট' দেখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা ম্যাক সেনেটের নজরে আসেন। তিনি ভিক্ষুকের ভূমিকা গড়ে তুলেছিলেন, যেটি মূলত ছিল একটি কৌতুক বিবর্তনের ধারণা, যা বেশ উল্লেখযোগ্য। ধারণাটি জর্জ বার্নার্ড শ পর্যালোচনা করেছেন এটির 'উচ্চারিত বিষণ্ণতা এবং দুর্বোধ্য হাস্যরসের সমন্বয়ের জন্য। সেনেটের সঙ্গে চুক্তির পর চ্যাপলিনের বড় উত্তরণ ঘটে। এরপর তিনি এসানে কোম্পানিতে (১৯১৫ সালে) যোগ দেন। সিডনি ও চ্যাপলিন তখন ইংল্যান্ড থেকে এসেছিলেন এবং তাঁদের প্রধান কৌতুক অভিনেতা হিসেবে কিস্টোনের সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের পরিবর্তে কাজ করেছিলেন। পরবর্তী বছরে চার্লি মিউচুয়াল ফিল্ম করপোরেশনের সঙ্গে ১২টি টু-রিল কমেডি তৈরির জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর মধ্যে রয়েছে 'দ্য ফ্লোরওয়াকার', 'দ্য ফায়ারম্যান', 'দ্য ভ্যাগাবন্ড', 'ওয়ান এএম', 'দ্য কাউন্ট', 'দ্য পনশপ', 'দ্য রিঙ্ক', 'ইজি স্ট্রিট', 'দ্য কিউর', 'দ্য ইমিগ্র্যান্ট' এবং 'দ্য অ্যাডভেঞ্চারার'।

১৯১৮ সালের প্রথম দিকে চ্যাপলিন ফার্স্ট ন্যাশনাল এক্সিবিটরস সার্কিটের সঙ্গে একটি নতুন অ্যাসোসিয়েশন তৈরির সিদ্ধান্ত নেন, যা বিশেষভাবে চলচ্চিত্র তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নতুন চুক্তির অধীনে তাঁর প্রথম সিনেমা ছিল 'আ ডগস লাইফ'। তার পরবর্তী বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ছিল যুদ্ধ নিয়ে একটি কৌতুক চলচ্চিত্র নির্মাণ। ১৯১৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'শোল্ডার আর্মস' চলচ্চিত্রটির বক্স অফিস সফলতা চ্যাপলিনের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দেয়। তাঁর চলচ্চিত্রগুলো ছিল দ্য কিড (১৯২১), আ ওম্যান অব প্যারিস (১৯২৩), দ্য গোল্ড রাশ (১৯২৫), দ্য সার্কাস (১৯২৮)। পরবর্তী সময়ে তিনি প্রযোজনা করেন সিটি লাইটস (১৯৩১), মডার্ন টাইমস (১৯৩৬) এবং দ্য গ্রেট ডিক্টেটর (১৯৪০)।

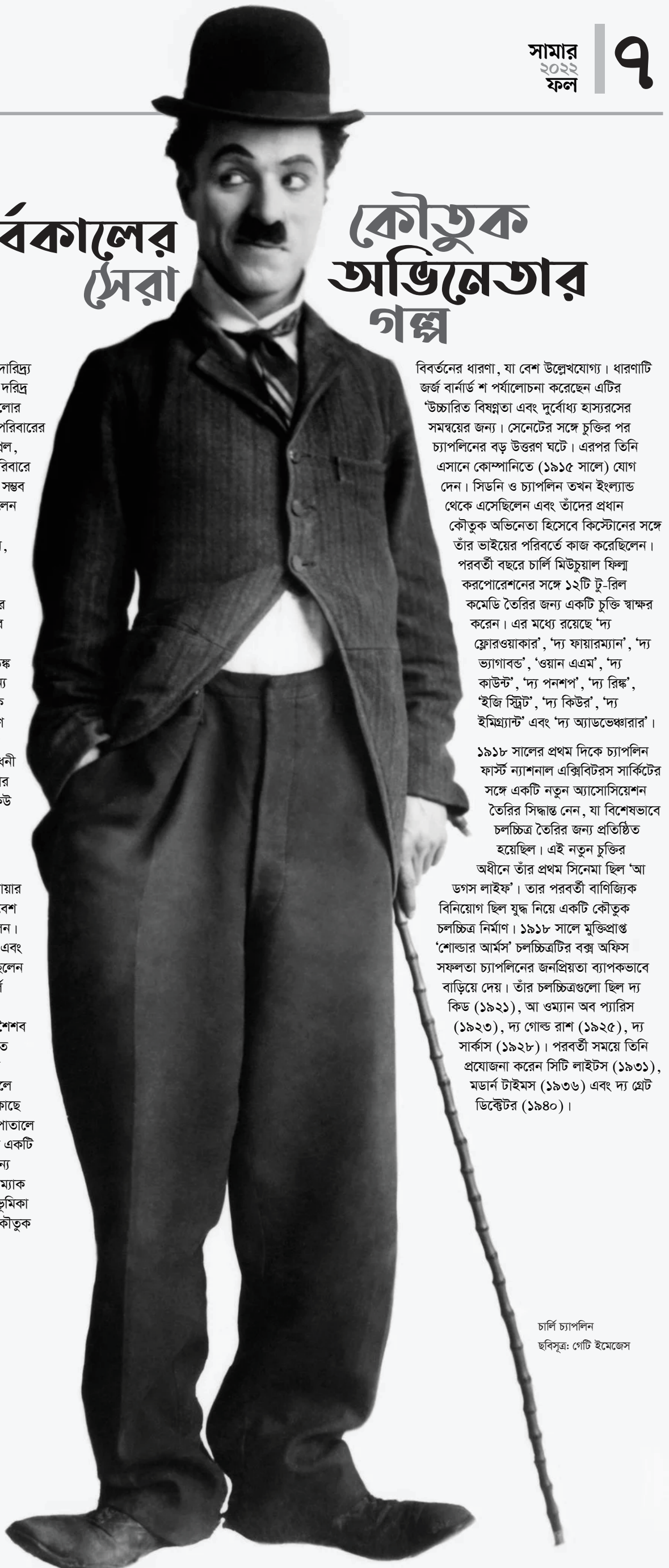

চার্লি চ্যাপলিন
ছবিসূত্র: গেটি ইমেজেস

শান্তিনিকেতনের পথে...

মৃন্ময় বসুনীয়া

যখন ভিসা করতে দিয়েছিলাম, তখন বাই এয়ার ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে ভারতে যাওয়ার অনুমতি মেলেনি। কোভিডের কারণে দীর্ঘ প্রায় দুই বছর সড়কপথে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। আমি ভিসা পাওয়ার ঠিক দু-তিন দিন পরই বাই রোডে সব ধরনের ভিসা চালু হয়ে যায়। যদিও ৩০০ টাকা খরচ করে ট্রাভেল মুড চেঞ্জ করে নেওয়া যেত, কিন্তু বিমানের টিকিট কনফার্ম করার পর আর চেঞ্জ করিনি! তা ছাড়া বিমানের টিকিট প্রায় ২০ দিন আগেই কেটে রেখেছিলাম, না হলে যাত্রার নিকটতম দিনগুলোতে টিকিটের দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়।

আমার ছোট বোন (পূজা) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে (শান্তিনিকেতন) অনার্সে ভর্তি হয়েছে। এত দিন অনলাইনে ক্লাস হলেও এখন অফলাইন ক্লাস ও পরীক্ষার জন্য ক্যাম্পাসে থাকা বাধ্যতামূলক। মূলত ওকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই আমার সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

আগের দিন বাড়ি থেকে মা, ছোট মামা সঙ্গে এসেছিলেন বিমানবন্দর পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানাতে। আমাদের ফ্লাইট ছিল ৮ এপ্রিল, বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৩৫ মিনিটে। বোর্ডিং পাস ও ইমিগ্রেশনের কিছু কাজের জন্য বিমান ছাড়ার প্রায় তিন ঘণ্টা আগেই বিমানবন্দরে উপস্থিত হতে হয়। এ জন্য সকাল সকাল বেশ খানিকটা সময় হাতে নিয়ে চেক-ইনের উদ্দেশ্যে রওনা হই। যাওয়ার সময় বন্ধু প্রীতমকেও সঙ্গে নিয়েছিলাম।

একে তো দেশের বাইরে প্রথমবার, তার ওপর আমাদের উভয়েরই প্রথম বিমানযাত্রা! তাই পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় বিমানবন্দর কাস্টমসে কর্মরত বন্ধু রিয়াদের সহযোগিতা চেয়ে আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু ওই দিন সে অফিশিয়াল কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আসতে পারেনি। পরে রিয়াদ তার এক কলিগকে আমার নাম্বার টেক্সট করে সবকিছু জানিয়ে দিয়েছিল এবং আমাকেও তার নাম্বার দিয়েছিল।

বিমানবন্দরে পৌঁছানোর আগে আগে বন্ধুর সেই কলিগ (রেজওয়ান ভাই) আমাকে ফোন করে কত দূরে আছি জানতে চাইলেন এবং কোন টার্মিনাল, কত নাম্বার গেটের সামনে যেতে হবে– সবকিছু বলে দিলেন। পৌঁছানোর পর একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা থেকে ব্যাগপত্র নামিয়ে ফোন দেওয়ামাত্রই উনি চলে এলেন।

সবাইকে ভেতরে যেতে দেবে না, তাই ওখান থেকেই বিদায় নিতে হবে! মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন! কিছুতেই ছাড়তে চাইছিলেন না আমাদের! বলা যেতে পারে, সেদিনের পর থেকে আমরা তিনজন তো একপ্রকার আলাদাই হয়ে যাচ্ছি!

পরিস্থিতি কিছুটা সামলে নিয়ে দ্রুত ভেতরে প্রবেশ করি। রেজওয়ান ভাই আমাদের লাগেজ দুটো নিয়ে স্ক্রিনিংয়ে দিলেন। যথাসময়ে চেক-ইন এবং লাগেজ স্ক্রিনিং শেষে নির্ধারিত বিমানের বোর্ডিং পাস পেয়ে গেলাম। রেজওয়ান ভাই লাগেজ দুটো বেল্টে দিয়ে আমাদেরকে ইমিগ্রেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন! ওনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা ইমিগ্রেশনে প্রবেশ করলাম।

ইমিগ্রেশন শেষ হওয়ার পর ওয়েটিং লাউঞ্জে বসে ফোনে বাইরে অপেক্ষারত মা, মামা ও প্রীতমকে ঠিকঠাকভাবে সবকিছু সম্পন্ন হয়েছে জানিয়ে চলে যেতে বললাম। কিছুক্ষণ পর স্পিকারে যাত্রীদের নির্দিষ্ট কাউন্টারে যেতে বলা হলো। সেখানে যাওয়ার পর আবারও চেকিং। এবার কাছে থাকা ব্যাগ, হাতঘড়ি, কোমরের বেল্ট– সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একদম বিমানের কাছের লাউঞ্জে যেতে দেওয়া হলো। ওখানে বসে আরও কিছু ফোনকল সেরে নিলাম। এরপর বিমানে ওঠার পালা।

বিমানের ভেতরে প্রবেশ করলাম। আসনে বসার পর স্পিকারে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হলো। কেবিন ক্রুরা সংকেতের মাধ্যমে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। একটু পরেই রানওয়েতে বিমান চলতে শুরু করল।

প্রথমবার আকাশে ওড়ার এ এক দারুণ অনুভূতি! উড্ডয়নের মুহূর্তটা আমাদের কাছে ছিল বেশ রোমাঞ্চকর। জানালা দিয়ে বাইরে দেখছিলাম, ওপর থেকে কতটা সুন্দর লাগে আমাদের দেশকে। যতই ওপরে উঠছি, নিচের সবকিছু ততই ছোট দেখাচ্ছে। যতক্ষণ সুযোগ পেয়েছি দেখার, মুগ্ধ হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম! এরপর মেঘের আড়ালে কখন যে নিজ দেশের সীমানা পেরিয়ে গেছি, তা বুঝতেই পারিনি।

ঠিক ৩০ মিনিট আকাশে ছিলাম। তারপর স্পিকারে জানিয়ে দেওয়া হলো, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান ল্যান্ড করবে। তার মানে, এখন আমরা ভিনদেশে!

নেমে গেলাম নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে, কলকাতায়। এখানকার সময় অনুযায়ী বেলা দুইটার একটু পর। এই বিমানবন্দর হয়তো আমাদের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মতো অতটা ব্যস্ত নয়, তবে সুন্দর।

আসার সময় সঙ্গে রুপি আনা নিষেধ। তাই বিমানবন্দরের ভেতরে মানি এক্সচেঞ্জে কিছু টাকা ভাঙিয়ে নিলাম। যদিও ওরা ডলারে কম রেট দিয়েছে। উল্টো দুনিয়ার চার্জ কেটে নিয়েছে! ভাবলাম, বাকি টাকা পরে ভাঙিয়ে নেব।

আমাদের কাছে ইন্ডিয়ান কোনো অপারেটরের সিম না থাকায় কারও সঙ্গেই যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। কলকাতায় পৌঁছানোর খবরটা অন্তত বাড়িতে কাউকে জানানো উচিত। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোনো উপায়ই যে ছিল না। অবশেষে আমাদের সঙ্গে আসা চাঁদপুরের একটা পরিবারের একজনের ফোন থেকে কোচবিহারে বসবাসরত এক পিসি ও ভাইকে ফোন করে পৌঁছানোর খবরটা দিলাম এবং বাড়িতেও জানিয়ে দিতে অনুরোধ করলাম।

এখানেও ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে বেল্ট থেকে লাগেজ নিয়ে বাইরে চলে এলাম। এবার আমাদের গন্তব্যে যাওয়ার পালা। আমাদের গন্তব্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতন! বোলপুর, বীরভূম জেলা। কলকাতা থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে।

বাইরে এসে দেখি, অনেকেই টাকা ভাঙানোর জন্য ঘোরাঘুরি করছেন। এক লোকের দেখা পেলাম, যাঁর কাছে আরও কিছু বাংলাদেশি টাকা ভাঙিয়ে নিলাম। ইনি বেশ ভালো রেট দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান রুপিগুলো হাতে নিয়ে বারবার নেড়েচেড়ে দেখছিলাম, জাল নোট আছে কি না। তা দেখে উনি অভয় দিয়ে বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। কাউকে দেখিয়ে যাচাই করে নিতে পারো। আর এটা কিন্তু আমাদের এক দিনের ব্যবসা নয়।' কথায় কথায় তিনি আরও বললেন, 'আমি তো তোমার দেশেরই লোক। আমাদের আদি বাড়ি ছিল গোপালগঞ্জে। এখনও যাওয়া-আসা হয় মাঝেমধ্যে। শোনামাত্র বুকটা না মিলিয়ে আর থাকতে পারলাম না।

মাঝবয়সী লোক। নাম চঞ্চল বিশ্বাস। অনেক আন্তরিকতা দেখালেন। ফোন নাম্বার নিলাম এবং ওনার ফোন থেকেই বিশ্বভারতীতে পড়ুয়া খুলনার রাজুদা ও আমাদের রংপুরের ছোট ভাই পার্থজিৎকে ফোন করে শুনে নিলাম, কীভাবে যেতে হবে। তা ছাড়া অরিন্দম দাদাও আগে থেকে অনেকটা বলে দিয়েছিলেন।

পার্থ আমাদের জন্য অনলাইনে হাওড়া স্টেশন থেকে বোলপুর পর্যন্ত বিশ্বভারতী এক্সপ্রেসের (সময় ৪টা ৩৫ মিনিট) টিকিট কেটে রেখেছিল। রাজুদা ট্যাক্সি নিয়ে সরাসরি হাওড়া যেতে বললেন। কিন্তু প্রিপেইড ট্যাক্সির সামনে বিশাল লাইন। ট্যাক্সি পেতে আরও খানিকটা দেরি হবে, আবার এদিকে ট্রেনেরও সময় হয়ে যাচ্ছে। তাই চঞ্চল কাকু পরামর্শ দিলেন বাসে যেতে। এসি বাস, ভাড়াও লাগবে কম। কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে হাওড়া যেতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে। কাকুকে জিজ্ঞেস করলাম, সিম পাওয়া যাবে কোথায়।

কাকু বললেন, আগে হাওড়া পৌঁছো, তারপর সময় পেলে সিম নিয়ে নেবে। এখন তাড়াতাড়ি বাসে ওঠো। সামনেই ৫০ গজ দূরে বাসস্ট্যান্ড। কাকু বাসে উঠিয়ে দিলেন।

বাস ছেড়ে দিল। এয়ারপোর্ট থেকে হাওড়া পর্যন্ত ভাড়া ৫০ রুপি। বাসে উঠে গন্তব্যের নির্ধারিত ভাড়া দিলে হাতে টিকিট ধরিয়ে দেওয়া হয়। ভাড়া নিয়ে সুপারভাইজারের সঙ্গে কারও কোনো কথা-কাটাকাটি/বাগ্‌বিতণ্ডা নেই। সুপারভাইজারও যথেষ্ট স্মার্ট। নির্দিষ্ট স্টপেজ ছাড়া যত্রতত্র গাড়ি থামেনি।

রাস্তাঘাট খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জ্যাম নেই। ওপরে ফ্লাইওভার। যেখানে সিগন্যালে লালবাতি জ্বলছে, গাড়ি সেখানেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, আবার সবুজ বাতি জ্বললে গাড়ি চলছে। সিগন্যালে পুলিশও তেমন চোখে পড়েনি। সব

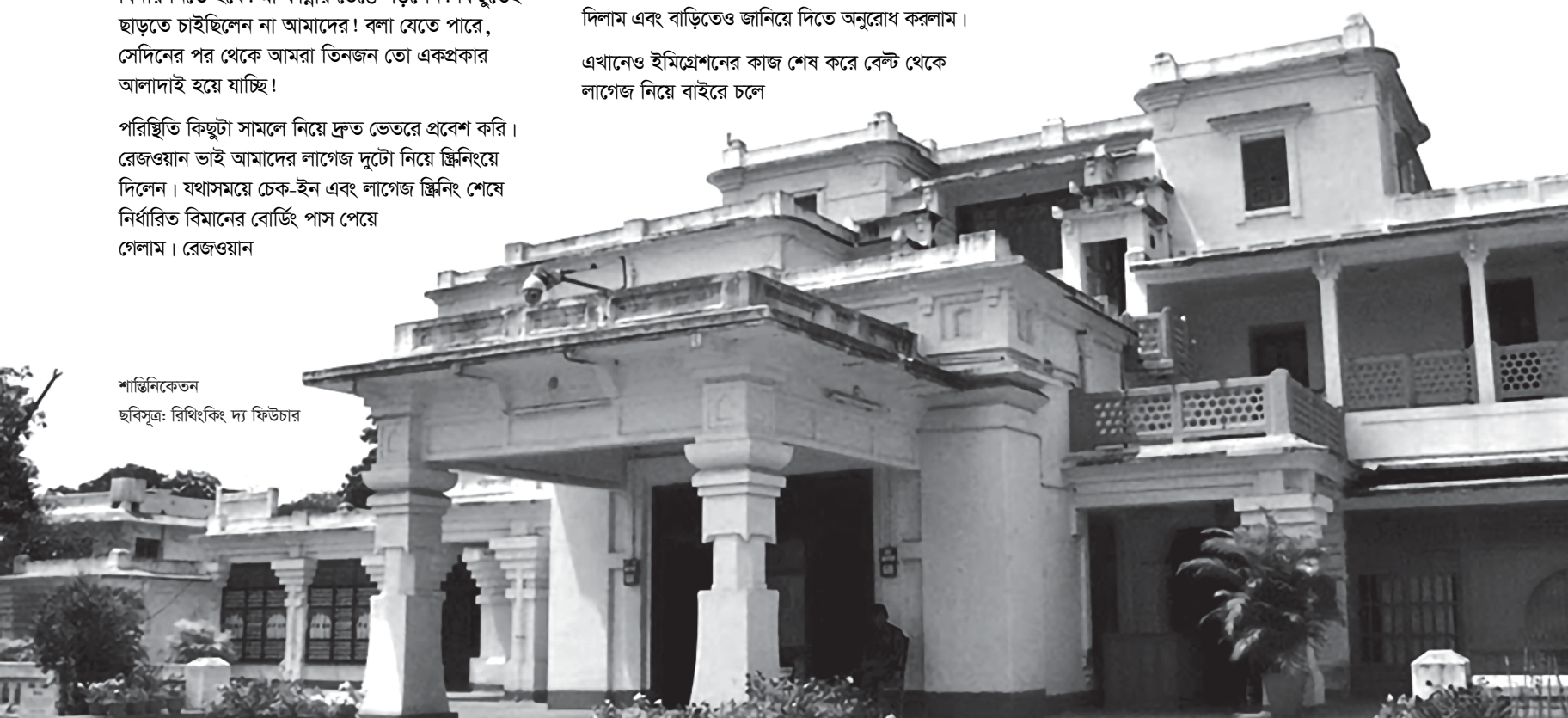

শান্তিনিকেতন
ছবিসূত্র: রিথিংকিং দ্য ফিউচার

সিস্টেমেটিক ওয়েতেই চলছে। কলকাতায় ফ্লাইওভারের নিচে আইল্যান্ডে কোথাও ফুল গাছ, কোথাও সৌন্দর্যবর্ধনকারী গাছ। অনেক সুন্দর ও পরিপাটি।

বড়বাজার, হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে ঠিক ৪টা ২৬ কি ২৭ মিনিটে বাস আমাদের হাওড়া স্টেশনে নামিয়ে দিল। লোকজন যে যার মতো করে ছুটছে। আমরাও অনুসরণ করে এগোচ্ছি। ট্রেন ছাড়ার আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। আমি দুই হাতে দুটো লাগেজ নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে নেমে আবার সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত প্ল্যাটফর্মে উঠলাম। অনেক বড় স্টেশন হাওড়া। কখন কোন ট্রেন, কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়ে যাবে–সব মনিটরে লেখা থাকে।

সম্ভবত রেলওয়েরই একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, শান্তিনিকেতনে যাওয়ার ট্রেনটা কোন প্ল্যাটফর্মে আছে। উনি জানি না বলে স্ক্রিনের লেখাটা দেখতে বললেন। এর মধ্যে আমারও কানে এসে বাজল...বোলপুর শান্তিনিকেতনগামী আরও কী কী যেন স্টেশনের নাম বলল, ট্রেনটি ১০ নাম্বার প্ল্যাটফর্মে আছে। একপ্রকার দৌড়ানোর মতো করে ১০ নাম্বার প্ল্যাটফর্মটা খুঁজে পেলাম। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বভারতী এক্সপ্রেস।

এবার রেলওয়ের অন্য একজনকে জিজ্ঞেস করে কনফার্ম হয়ে নিলাম যে এটাই শান্তিনিকেতনে যাবে এবং ছেড়ে দেবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমাদের কোচ নাম্বার ছিল উ৩। কিন্তু সেই কোচ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ট্রেন তখনই ছেড়ে দেবে ভেবে উঠে পড়লাম একটা বগিতে। তারপর দুই ভাইবোন লাগেজ দুটো নিয়ে এগোতে থাকলাম আমাদের টিকিটে উল্লিখিত কোচ/বগির উদ্দেশে। একেকটা বগি আমাদের দেশের দুটো বগির সমান। এখানকার ট্রেনগুলো বেশ বড়। যে বগিতেই যাই, যাকেই জিজ্ঞেস করি, সবাই বলে, আমাদের বগি নাকি আরও সামনে। আমরাও তাদের কথামতো এগোতে থাকি। কিন্তু কোচ/বগির আর দেখা মেলে না!

এরপর পূজা বলল, এক কাজ করি চলো, নেমে আবার দৌড়ানো শুরু করি। ট্রেন একেবারেই ছাড়ার মুহূর্তে যে বগিটা পাওয়া যাবে সেখানেই উঠে পড়ব। বুদ্ধিটা ভালো মনে করে নেমে লাগেজ নিয়ে আবার দৌড়ানো শুরু করলাম। শেষমেশ গিয়ে উঠলাম উ৫-এ। ট্রেনও চলা শুরু করে দিল। এরপর ট্রেনের ভেতরে আবার হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম কাঙ্ক্ষিত বগিতে। এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বসলাম আমাদের আসনে। জানালার পাশের একটা আসন, আরেকটা বার্থে। আসনের পেছনেই দুপাশে বগির মাঝখানের দুটো দরজা। আমরা যখন ট্রেনে উঠেছি, তখন ভরা বিকেল। ট্রেন ছুটে চলেছে তার নিজস্ব গতিতে। আর আমরা জানালা দিয়ে, মাঝে মাঝে দরজায় দাঁড়িয়ে দুপাশের প্রকৃতি অবলোকন করছি। লাল মাটি, ফসলের খেত এবং চারদিকে সবুজ আর সবুজ। তবে আমাদের সবুজের সঙ্গে এখানকার সবুজের বেশ পার্থক্য লক্ষ করেছি। আমাদের সবুজটা এখানকার চেয়ে গাঢ়। একটু বেশিই মায়াবী। এমনকি এখানকার গ্রামগুলোর চেয়েও আমাদের গ্রামগুলো বেশি সুন্দর। আমাদের গ্রামগঞ্জের প্রকৃতিতে সৌন্দর্যের একটা মাদকতা রয়েছে। হাওড়া থেকে বোলপুর, শান্তিনিকেতন তিন ঘণ্টার বেশি জার্নি। ট্রেন নির্দিষ্ট স্টপেজে থামছে। লোকজন উঠছে আবার নামছে। আমাদের ট্রেনটা একেবারেই লোকাল কোনো স্টেশনে দাঁড়াচ্ছে না। রেললাইনগুলো ব্রডগেজ। পাশাপাশি দুটি বা তিনটি লাইন। চলমান ট্রেনগুলো না থামিয়েই একটার সঙ্গে আরেকটার ক্রসিং হচ্ছে। এ দেশের লোকাল স্টেশনগুলোও আমাদের দেশের যেকোনো আন্তঃনগর স্টেশনের চেয়ে উন্নত এবং অনেক সুবিধাসম্পন্ন। আমার পাশেই বসে থাকা এক লোকের সঙ্গে পরিচিত হলাম। উনি রামপুরহাটে যাবেন। বোলপুর থেকে আরও বেশ কয়েকটা পরের স্টেশন রামপুরহাট। অনেক কথা হলো ওনার সঙ্গে। বাংলাদেশে যাননি কখনও, তবে কলকাতার যশোর রোড হয়ে বেনাপোলের কাছাকাছি পর্যন্ত গিয়েছিলেন। ব্যস্ততার কারণে আমাদের সিম কেনার কোনো সুযোগ হয়নি, তাই বাড়িতে যোগাযোগের জন্য ওনার সহায়তা চাইলাম। নির্দ্বিধায় ফোন দিয়ে দিলেন। এরপর ওনার ফোনে মেজদার নাম্বারটা সেভ করে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মেজদা ও পার্থকে কল করে আমাদের অবস্থান জানিয়ে দিলাম। দাদার এই অসামান্য উপকারের জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানালাম। উনি বললেন, 'মানুষ তো মানুষের জন্যই। মানুষ হয়ে এই সামান্যটুকু করতে পারব না, তা হয় নাকি দাদা।' কথাটা শুনে ওনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আর খুঁজে পেলাম না।

খুব পিপাসা ও খিদে পেয়েছিল। সেই যে সকালবেলা খেয়ে বেরিয়েছি আর খাওয়ার সময় পাইনি। ওই দাদার কাছে থাকা জলের বোতলটা চেয়ে নিয়ে গলা ভেজালাম। হকাররা ট্রেনের মধ্যে জলখাবার বিক্রি করছিল। একটা ঠান্ডা জলের বোতল কিনলাম। এই অপরিচিত লোকটা যে উপকার করলেন, মনে হলো তাঁকে অন্তত কিছুটা আপ্যায়ন করা উচিত। একটু পর দাদাসহ চা খেলাম, বাদামও খেলাম।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার পর ট্রেন বর্ধমান জংশনে এসে থামল। লোকজনের পাশাপাশি হকাররাও খাবার বিক্রির জন্য উঠেছে। তবে বৈরাগী-বোষ্টমী টাইপের জটাধারী কিছু লোক হাতে বাটি নিয়ে টাকাপয়সা চেয়ে নিচ্ছিলেন। আরেকজনকে দেখলাম, উনি গান গেয়ে গেয়ে টাকা তুলছেন। কনুই পর্যন্ত আছে কিন্তু এরপর, অর্থাৎ কবজি নেই। সেই কনুইয়ে দুটো কাঠি বেঁধে অবলীলায় ঢোল বাজিয়ে 'ছেড়ে দিলে সোনার গৌড়' গেয়ে চলেছেন। কী অসাধারণ গানের গলা! মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। আমাদের পেছনের বগিতে তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) কিছু মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। একটু পরেই ওরা এল আমাদের বগিতে। একজন হাতে তালি বাজিয়ে আমার কাছে টাকা চাইতেই বললাম, আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি। কাছে খুচরো টাকা নেই। সে বলল, 'বাংলাদেশ থেকে এসেছ তো কী হয়েছে? তোমাদের হাসিনা দিদি কি আমাদেরকে টাকা দিতে নিষেধ করেছে নাকি?' দুই ভাইবোন আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। পরে দশ টাকা নিয়ে চলে গেল।

এদিকে খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। কুড়ি টাকা দিয়ে নিলাম বাটার টোস্ট, আর দশ টাকা দিয়ে মাটির ভাঁড়ের চা। সহযাত্রী ওই দাদাকে আরও এক ভাঁড় চা খাওয়ালাম। জানতে চাইলাম, শান্তিনিকেতন কত দূরে? সঙ্গে সঙ্গেই পাশে থাকা এক বৃদ্ধা বললেন, 'আরও দু-তিনটে স্টেশন পর।' এতক্ষণ আমাদের পাশে অন্য আসনগুলোতে একটা পরিবারও বসা ছিল। প্রবীণ ভদ্রমহিলা তাদেরই একজন। এই দীর্ঘ যাত্রায় তাঁদের সঙ্গে একবারও আলাপ হয়নি। কিন্তু গন্তব্যের প্রায় কাছাকাছি এসে কথাবার্তা হলো। ওনারা বোলপুরের পরের স্টেশনে নামবেন। ওখানেই বাড়ি। তারপর উনি বললেন, 'বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তো। আমি বাংলাদেশেরই মানুষ। বাবার বাড়ি ফরিদপুরে।' আমি কপালে হাত দিয়ে বিস্মিত হয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁর জন্ম নাকি বাংলাদেশে, কিন্তু বৈবাহিক সূত্রে উনি এখানকার বাসিন্দা হয়েছেন। সঙ্গে তাঁর মেয়ে, নাতনি এবং এক আত্মীয় ছিলেন। ওনার মেয়ে জিজ্ঞেস করলেন...কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি। আরও বললেন, বাংলাদেশে এখনও তাঁদের আত্মীয়রা আছেন। যাওয়াও হয়েছিল দু-তিনবার। ওনাদের সঙ্গে থাকা আত্মীয় ভদ্রলোকটি যোগ করে বললেন, তাঁরও পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল মানিকগঞ্জে। একাত্তরে যুদ্ধের সময় তাঁর বাবা সপরিবারে চলে এসেছেন এ দেশে। তাঁদের কথা শুনে বারবার মনে হচ্ছিল, তাঁরা তো আমাদেরই কেউ না কেউ। বললাম, ভিনদেশে এসে কারও কাছে যখন শুনি, তাঁর শিকড় বাংলাদেশে, তখন মনে হয় মানুষগুলো আমাদের একান্ত আপনজন। কোথায় যেন একটা টান অনুভব করি। ওনারাও একই কথা বললেন।

দেখতে দেখতে বোলপুর পৌঁছে গেলাম প্রায় আটটা নাগাদ। যাত্রাপথে স্বল্প সময়ের জন্য পরিচিত হওয়া এই মানুষগুলোকে এবং রামপুরহাটের সেই দাদাকে আবারও ধন্যবাদ দিয়ে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলাম। ট্রেন থেকে নামার পর মনে হলো, আরে, দাদার নামটা তো জানা হয়নি। জিজ্ঞেস করব, কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন স্টেশন ছেড়ে গেছে। আফসোস থেকে গেল, হয়তো আর কখনও দেখা হবে না ক্ষণিকের পরিচয়ে আপন হওয়া পরোপকারী এই কয়েকজন মানুষের সঙ্গে। তবে তাঁদের সহযোগিতা কোনো দিন ভোলার নয়।

বেশ ছিমছাম, সাজানো-গোছানো একটা স্টেশন বোলপুর। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম স্টেশনের বাইরে। এসেই চোখে পড়ল 'গীতাঞ্জলি রেল জাদুঘর'। সব ক্লান্তি ও খারাপ লাগা যেন নিমেষেই দূর হয়ে গেল। টোটোওয়ালারা বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, কোথায় যাব। আমাদের দেশে যেটাকে অটো বা ইজিবাইক বলি, এখানে সেটার নাম টোটো। আমরা পার্থর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এক টোটোওয়ালার ফোন থেকে কল দিতে না দিতেই ও বাইক নিয়ে চলে এল। পার্থ বিশ্বভারতীতে ইকোনমিকসে পড়ে। এই প্রথম ওর সঙ্গে দেখা। এত দিন শুধু ফোনেই কথা হয়েছে আমাদের। বুকটা মিলিয়ে নিলাম। এখানে আসা অবধি ও যা উপকার করেছে, সেই ঋণ কখনও শোধ করার মতো নয়। সঙ্গে বিশ্বভারতীতে পড়ুয়া আরও একজন এসেছে। পরিচিত হলাম, নাম নাজমুস সাকিব! সেও আমাদের রংপুরের ছেলে। বাস টার্মিনালের পাশে বাড়ি। বললাম, 'এ চ্যাংড়াও তো তাইলে হামারে এলাকার।' হো হো করে হেসে উঠল দুজনেই। এরপর টোটোতে করে রওনা দিলাম আমাদের জন্য বুক করে রাখা হোটেলের উদ্দেশে। হোটেলটি বোলপুরের ভুবনডাঙ্গায়। পার্থ আগে থেকে সব ঠিক করে রেখেছিল। স্টেশন থেকে বোলপুর বাজার হয়েই হোটেলে আসতে হয়। নিরিবিলি মফস্বল শহর বোলপুর। আসার সময় যে রাস্তা দিয়ে এসেছি, সেটাকে আমাদের সুন্দরগঞ্জের কলেজ মোড় থেকে বাহিরগোলা জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তাটা যেমন, ঠিক তেমনই মনে হয়েছে। পুরো এলাকাতেই শিল্প-সংস্কৃতির ছোঁয়া। সুন্দর ও পরিষ্কার রাস্তাঘাট। নেই কোনো কোলাহল। যে যার মতো চলছে।

কলকাতা থেকে এখানে আসা অবধি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি, নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বালাই নেই। কোনো পুরুষও তাদের প্রতি ভিন্নচোখে তাকায় না। নারীরা তাদের কমফোর্ট অনুযায়ী ড্রেস পরে। প্রায় অধিকাংশ নারীকে, এমনকি ৫০ বছরের বেশি বয়সী নারীকেও দেখলাম শাড়ি পরে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। যত দূর মনে হলো, এখানে সবারই ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে। এমনকি রাত-বিরাতেও রাস্তাঘাটে ছেড়ে দেওয়া গরুর দেখা মেলে। কার গরু কে জানে। লজ মোড়ে বিশ্বভারতীর একটা গেট চোখে পড়ল। পার্থ বলল, 'বিশ্বভারতীর এরিয়া এখান থেকেই শুরু। অবশেষে পৌঁছালেন তবে শান্তিনিকেতনে।'

হোটেলে পৌঁছে চলে এলাম রুমে। ডাবল বেডের রুম। ভাড়া ৮০০ টাকা, আর সিঙ্গেল বেডের ভাড়া ৪০০ টাকা। মোটামুটি ভালো মানের হোটেল। পার্থ ও সাকিব রুম পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। ফ্রেশ হয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে আমরাও চলে গেলাম ঘুমের রাজ্যে...

ছবিসূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

প্রিয় মা

পত্রের শুরুতে আমার সালাম ও শ্রদ্ধা নিয়ো। আশা করি পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে সুস্থ ও ভালো আছ। আজ মনে বিশাল এক ক্ষত নিয়ে লিখতে বসেছি। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সৃষ্টি করছেন সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে, যাকে বলে আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির সেরা জীব হয়েও কিছু মানুষ আজ পশুর চেয়েও অধমে নেমে গেছে। তারা হয়তো তাদের ভালো-মন্দের বিচার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তাদের পাপের বোঝায় আজ আমার হৃদয় ভারী হয়ে আর্তনাদ করছে, ছটফট করছে।

গতকালের পত্রিকায় একটি শিরোনাম চোখে পড়ল, সেটি পড়ে বুকের মধ্যে কেমন যেন একটি ক্ষত তৈরি হয়ে গেল। বিস্তারিত পড়ার জন্য পত্রিকাটির ভেতরের পাতায় চলে গেলাম। শিরোনামটি ছিল 'সম্পদের লোভে নিজের মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এলো ছেলে'। খবরটির যত বিস্তারিত পড়ছি, ততই শরীরজুড়ে একটা শিহরণ বয়ে চলছে। শুধু বৃদ্ধাশ্রমে রেখেই পাষাণ হৃদয় সন্তানের মন শান্ত হয়ে যায়নি। সম্পূর্ণ সম্পদের মালিকানা লিখে না দেওয়া পর্যন্ত ওই মাকে আটকে রাখত একটি অন্ধকার ঘরে, দুই বেলা নামমাত্র খাবার জুটত অসহায় ওই মায়ের। শুধু তা-ই নয়, কথায় কথায় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে হতভাগী মায়ের। সকল সম্পদ লিখে দেওয়ার পর তাঁর শেষ জায়গা হয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে।

আজ নিজেকে কারও সন্তান বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা হচ্ছে, মানুষ হিসেবে আজ আমরা কতটা নিচে নেমে গেছি! আমায় ক্ষমা করবে মা। আজ প্রচণ্ড অনুশোচনা বোধ করছি, কত জেদ ধরে রাগ করে তোমায় কষ্ট দিয়েছি, অথচ রাতের পর রাত আমার অসুস্থতার কথা ভেবে তুমি নির্ঘুম পার করেছ। কত মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছি সব পরীক্ষার আগে। না বলে চলে যেতাম দূরে; ফিরে আসতাম সন্ধ্যার পর। আজ খুব ছোট এবং অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। আমায় ক্ষমা করে দেবে মা, তোমার অবাধ্য সন্তান আজ তোমার কোল থেকে দূরে থেকে বড় মানুষ হচ্ছে। আমি যেন তোমায় রানির মতো রাখতে পারি, সে জন্য দোয়া করবে মা।

ভালো থাকবে মা, আর আমায় ক্ষমা করবে– এই প্রত্যাশায় আজ এখানেই সমাপ্ত করছি। নিজের প্রতি খেয়াল রাখবে।

ইতি

তোমার অবাধ্য ছেলে

ফাহিম

স্নেহময়ী মা

তুমি কেমন আছ, মা। কীভাবে দিন কাটছে তোমার। অনেক দিন তোমার মুখখানি দেখি না। ইদানীং তোমার কথা ভীষণ মনে পড়ে। তোমার কি আমার কথা মনে পড়ে?

মা, আজ তিন মাস হলো তোমার সঙ্গে নেই। ঢাকার এই ব্যস্ত শহরে কেউ কারও খোঁজ রাখে না। জীবন এখানে যান্ত্রিক। আমার শুধু তোমার কথা মনে পড়ছে, আর বুকের ভেতর এক মমতার-শূন্যতার হাহাকার চলছে। আজ কত দিন হলো, মা বলে ডাকতে পারছি না, মা গো। এখন আর আমাকে কেউ মায়ের মতো আদর করে ডাকে না। তোমাকে যখন খুব বেশি মনে পড়ে, তখন রাতে ওই চাঁদটার দিকে তাকিয়ে ভাবি, বাড়ি থেকে তুমিও হয়তো চাঁদটাকে দেখছ আর আমার কথা ভাবছ। জানো মা, আমি না বড়ই একা আর এই পৃথিবীটা বড়ই স্বার্থপর। ইউনিভার্সিটির হলে বসে মা তোমার কথা ভাবি আর ছলছল চোখ দুটো দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ে। 'মা' শব্দটা যে কতটা আপন, তা আগে বুঝতে পারিনি। একটি মুহূর্তের জন্যও তোমাকে ভুলতে পারি না এখন।

বাড়িতে যখন থাকতাম, তোমার আহ্লাদি, ভালোবাসা, যত্ন মাঝেমধ্যে খুব বিরক্ত লাগত। ভাবতাম, সারাক্ষণ কেন এত খেয়াল রাখে! অথচ সেই তুমি নিজের কোনো খেয়াল রাখতে পারোনি। সারা জীবন সংসার আর আমাদের দেখে গেলে। এদিকে আমরা তোমার এই ত্যাগ, অক্লান্ত পরিশ্রমের কখনোই মর্যাদা দিইনি। উল্টো তোমাকে উপেক্ষা করতাম, তোমাকে অগ্রাহ্য করতাম। পারলে আমায় ক্ষমা করে দিয়ো, মা।

জানো, মা? এখানে বাসায় আসার পর কেমন যেন একা লাগে। বাড়িতে তুমি সারাক্ষণ আমার পাশে থাকতে আর এখন, এই সেই আমি বড় একা। মাঝেমধ্যে রাঁধতে ইচ্ছে করে না। না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। অথচ তুমি প্রতিদিন আমাদের কথা ভেবে চুলোর কাছে যেতে। রাঁধতে। আমরা লবণ কম হলে কত চিল্লাচিল্লি করতাম। তুমি রাগ না হয়ে হাসিমুখে বলতে, পরেরবার খেয়াল রাখবে।

আমার এখনও মনে আছে, তুমি আমার চুলে তেল ঘষে ডান দিকে একটা সিঁথি কেটে দিতে। আজ আমি মাঝে মাঝে সিঁথি কাটি, কিন্তু তোমার মতো হয় না গো, মা। আবার মাঝে মাঝে গালে হাত দিয়ে তোমার হাতের স্পর্শ খোঁজার চেষ্টা করি।

মা, তোমার মতো নিঃস্বার্থ কবে হতে পারব? আমরা যে তোমাকে মূল্যায়ন করি না, তাতে কি তোমার কষ্ট হয় না? কষ্ট পাওয়ারই তো কথা। অজান্তে অনেকভাবে তোমাকে ব্যথা দিয়েছি। পারলে ক্ষমা করে দিয়ো।

এবার বাড়ি এলে আমি সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকব। তত দিন নিজের খেয়াল রেখো। তোমায় অনেক অনেক ভালোবাসি, মা।

ইতি

তোমার মেয়ে

আনিকা

ছবিসূত্র: টোনো কুবালিক

মমতাময়ী মা

কেমন আছ? আশা করছি ভালো আছ। তোমার শরীর এখন প্রায়ই অসুস্থ থাকে। খবর আমি রাখি, তবে যাই না তোমার সামনে। নিজেকে এত ছোট করে ফেলেছি যে তোমার সামনে যাওয়া কিংবা তোমার সঙ্গে কথা বলার মুখ আর আমার নেই। তাই এই লেখার পথটাই বেছে নিলাম। তোমার কথা এখন প্রতিটা মুহূর্তে আমার মনে পড়ে। প্রতিটা কাজে মনে হয়, তুমি পাশে থাকলে আরও সহজ হয়ে যেত। কিন্তু সেই পথ আমিই নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়েছি।

মা, তোমার অনুপস্থিতি আমি এখন প্রতিটা মুহূর্তে অনুভব করি। আমার ছোটবেলার কথা খুব মনে পড়ে। তোমার আমাকে শাসন করা, সেই শাসনগুলো যে কত দরকার ছিল, আজ তা বুঝি। তোমার আমাকে স্নেহ করা, খেয়াল রাখা– এই সব তোমার থেকে বেশি আর কেউ করত না। আর কেউ কখনও করবেও না। তোমার মতন কেউ আমাকে ভালোবাসতেও পারবে না। আমার পড়াশোনার জন্য কতই না সময় দিয়েছ। শেষে আমার পড়ার ক্ষতি হবে, তাই নিজের স্কুলের চাকরিটা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলে। তুমি অনেক কিছু ত্যাগ করলে আমার জন্য, কিন্তু আমি বড় হয়ে ত্যাগ করলাম তোমায়!

দেখো, আজ আমি বড় হয়েছি। এত বড় যে আজ তোমাকেই আর আমার সঙ্গে রাখিনি। সেদিন আমার জন্যই সব এলোমেলো হয়ে গেল। ভুলেই গিয়েছিলাম হয়তো, সারা জীবন যে মানুষটা আমার খেয়াল রেখেছে, সেই মানুষটার সামান্য খেয়াল আমি রাখতে পারলাম না। তুমি যেতে চাওনি বৃদ্ধাশ্রমে। থাকতে চেয়েছিলে আমার সঙ্গে। আমি শুনিনি তোমার কথা। জোর করে তোমাকে পাঠিয়ে ছিলাম সেখানে। আরও কত বিরক্ত হয়েছি। তুমি শিশুর মতন যখন প্রশ্ন করতে নতুন জিনিস জানার জন্য, তখন কতই-না বিরক্তি নিয়ে কথা বলতাম। অথচ ছোটবেলায় আমার কত কথার উত্তর দিতে, নিজ হাতে নতুন নতুন সবকিছু শিখিয়েছ।

আজ নিজের কাছে নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয়। সামান্য খেয়াল রাখতে পারলাম না তোমার! আমায় তুমি ক্ষমা কোরো, মা। তুমি অভিমানে জানিয়ে দিয়েছিলে, আমার মুখ আর তুমি দেখবে না। তখনও বুঝিনি, আমি কী হারাচ্ছি। অনেক পরে হলেও আজ আমি বুঝি।

মা, আমার উপলব্ধি হয়েছে। আমি জানি না, এই চিঠির পর আমার প্রতি তোমার রাগ কমবে কি না। তবে তোমার সন্তানকে তুমি ক্ষমা করে দিয়ো। আমি তোমাকে ছাড়া আজ সত্যিই ভালো নেই, মা।

ইতি

তোমার মেয়ে

নূর

মা

আজ অনেক দিন পর তোমায় লিখছি। চিঠির বিষয়বস্তু অন্য দিনের চেয়ে ভিন্নতর, কিছুটা আবেগপ্রবণ। না লিখে উপায় ছিল না; কারণ, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতন পাঁজর নেই।

গত দিনের পত্রিকায় বেরিয়ে আসা নিষ্ঠুর ঘটনাটি পড়েছ নিশ্চয়। সেখানে একজন অপরাধীর কথা তুলে ধরলেও আমরা অনেকে এমন অপরাধের অংশীদার। সমাজের এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাকে চরম ভাবনায় ফেলেছে। এর থেকে উপলব্ধ অনুতাপ আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। বলতে পারো, চিঠিটি তারই বহিঃপ্রকাশ।

আজ খুব করে মনে পড়ছে পুরোনো দিনের কথা, কেমন করে তুমি আগলে রাখতে সবাইকে। কেবল তোমাকে আগলে রাখার সময় হলো না কারোর। নিজেদের প্রয়োজনের ভিড়ে তোমাকে এতটাই ব্যস্ত করে দিয়েছিলাম যে, তুমি নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলেছিলে। আজ এই অনুতপ্ত মন জানে, কতশত ত্যাগ স্বীকার করে তুমি আমাকে এই জীবন উপহার দিয়েছ, যা হয়তো তোমারও হতে পারত। তোমার সকল সাফল্য, প্রাপ্তি– সবটাই আমার কেড়ে নেওয়া। আর এই আমি নাকি আজ তোমার অনুপস্থিতিতে নিঃস্ব।

তোমার সঙ্গে উচ্চস্বরে বলা কথাগুলো আজ খুব কানে লাগছে। তোমার প্রতি করা অন্যায় আমাকে তীব্র অনুশোচনায় ঠেলে দিচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে চোখ মেলাতেও পারব না। আজ জানি মা, কতটা নিঃস্বার্থ ও নিষ্পাপ ছিলে তুমি; আর আমি নিষ্ঠুর। আমার কারণে অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছ, আঘাত সহ্য করেছ। এই পাপ কখনোই মুছবার নয়, কেবল দুই হাত জোড় করে ক্ষমাই শুধু চাইতে পারি।

ও মা, পারবে তো আমাকে ক্ষমা করে দিতে? আমি যে বড়ই ব্যথিত, অনুতপ্ত। এসব আমায় কাতর করে তুলছে। পারলে আমায় ক্ষমা কোরো মা, আমায় ক্ষমা কোরো।

ইতি

তোমার

রুহামা

ছবির গল্প

ঢাকার বুকে সবুজে ঘেরা ইউল্যাব

মৃন্ময় কুমার শীল

নগরায়ণের এই যুগে আমরা একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানেই বুঝি কংক্রিটে ঘেরা উঁচু উঁচু দেয়াল, আর তার মধ্যে গুটিকয়েক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বদ্ধ শ্রেণিকক্ষ। অথচ এই শহরের অভ্যন্তরেই আধুনিকতা আর নিরিবিলি প্রাকৃতিক সমারোহের মিশেলে গড়ে উঠেছে একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ। লোকমুখে যা শোভা পায় ইউল্যাব নামে। খুব অল্প সময়েই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউজিসির নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। আধুনিক স্থাপত্যবিন্যাসে এই সবুজ স্বর্গ ঢাকার মোহাম্মদপুরে নিরিবিলি পরিবেশে স্থাপিত হয়েছে। চিরসবুজ এই ক্যাম্পাসকে ভালোবেসে শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ এর নাম দিয়েছেন তাঁদের বৃন্দাবন।